# বহু দৃষ্টিতে হেমচন্দ্র

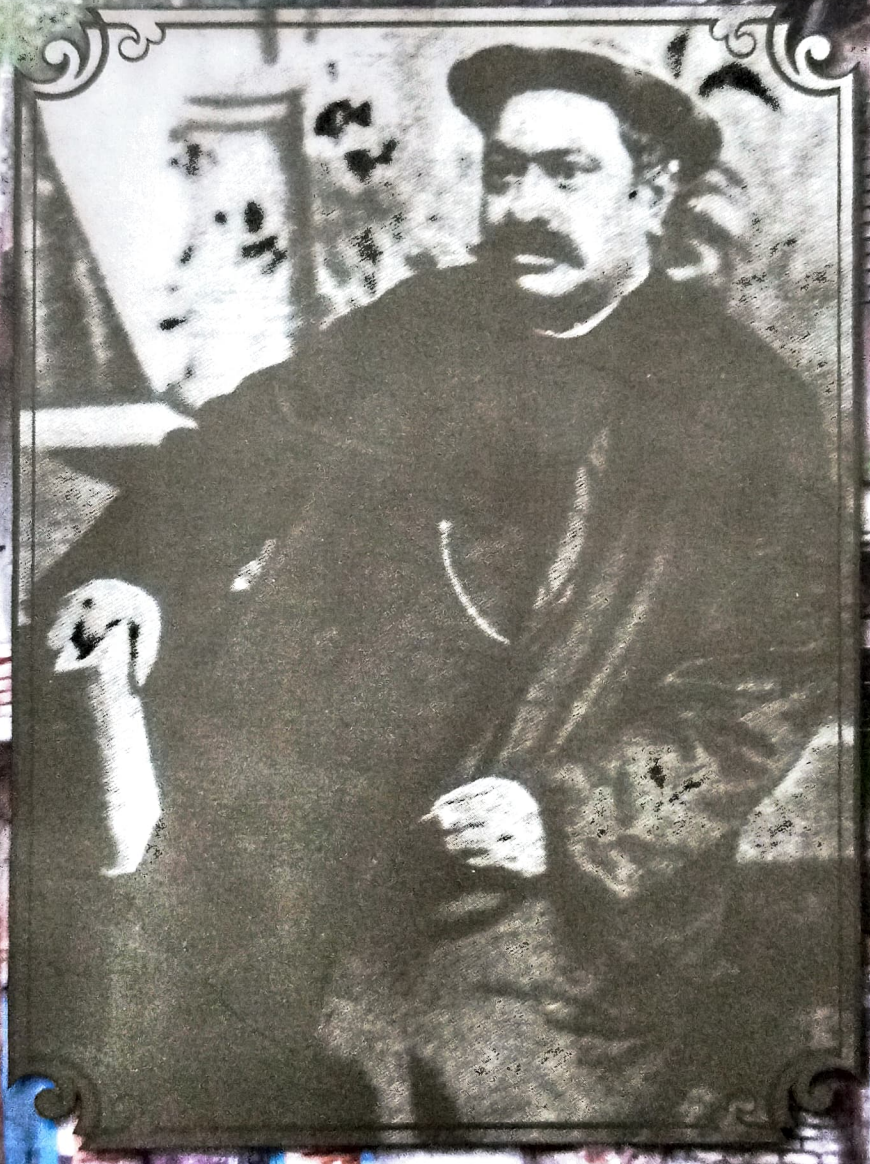

সম্পাদনা
বরুণকুমার চক্রবর্ত্তী

বহু দৃষ্টিতে হেমচন্দ্র

BAHU DRISTITE HEMCHANDRA— It is a collection of Essays from various angles on Poet Hemchandra Bandyopadhyay. Edited by Barunkumar Chakroborty & Published by Marali Prakasani, Jhilpar Road, Baksara, Howrah-10 in favour of Hemchandra Library, 11/1, Mohan Chand Road, Kidderpore, Kolkata-700023, 9th of March, 2023


প্রকাশকাল : বৃহস্পতিবার, ২৪ ফাল্গুন, ১৪২৯
Published : Thursday, 9 March, 2023



গ্রন্থস্বত্ব : হেমচন্দ্র লাইব্রেরী
Copyright : Hemchandra Library



প্রচ্ছদ ভাবনা : প্রদীপকুমার ঘোষ
Cover idea : Prodip Kumar Ghosh

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণে : **রেনবো**
১৪/১বি রামকমল স্ট্রিট, খিদিরপুর
কলকাতা-৭০০ ০২৩
দূরভাষ : ৯৪৩৩৩ ১০৫২২ / ৯৪৩৩৪ ৫১৮৭৩
E-mail : rainbowcmyk@gmail.com/
rainbowcmyk@yahoo.com

ISBN : 978-81-957898-3-2

মূল্য : ২৫০/ টাকা
Price : 250/- Only


## প্রাককথন

খিদিরপুরের দুই কবি মধুসূদন এবং হেমচন্দ্র। কিন্তু প্রথমজন বহু চর্চিত, দ্বিতীয় জন অবহেলিত, অবজ্ঞাত, একথা ঠিকই যে প্রতিভার বিচারে মধুসূদন অনেক এগিয়ে সে তুলনায় হেমচন্দ্র অনেকখানি পিছিয়ে। তবু যে পরিমাণ মনোযোগ হেমচন্দ্র দাবী করেন, আমরা তা মেটায়নি। হেমচন্দ্রের স্মৃতিতে গঠিত হেমচন্দ্র পাঠাগার খিদিরপুরের গৌরব। শতবর্ষ অতিক্রান্ত এই পাঠাগার একদা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্মৃতি ধন্য হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। লাইব্রেরীর বর্তমান কর্তৃপক্ষ হেমচন্দ্র স্মরণে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আরও কত কী। বর্তমান কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ তাঁরা লাইব্রেরীর ১১৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে 'বহু দৃষ্টিতে হেমচন্দ্র' নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করতে চলেছেন, খিদিরপুর নিবাসী হয়ে এই গ্রন্থের সম্পাদনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে সৌভাগ্যবান মনে করছি নিজেকে।

১লা মার্চ, ২০২৩ বরুণকুমার চক্রবর্তী

# সূচি


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| লাইব্রেরী সম্পাদকের কলমে | *প্রদীপকুমার ঘোষ* | ৭ |
| কবি হেমচন্দ্র:এক ভাগ্য বিড়ম্বিত মহাজীবন | *প্রদীপকুমার দাশগুপ্ত* | ১০ |
| হেমচন্দ্র চর্চার প্রাসঙ্গিকতা | *স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়* | ১৭ |
| হেমচন্দ্র ও সমকাল | *সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়* | ২৫ |
| বাংলা সাহিত্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | *মোঃ জুবায়েদ হোসেন* | ৩৭ |
| ভূমিকার আকাশ ও হেমচন্দ্র | *গৌতম মুখোপাধ্যায়* | ৪৩ |
| বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে হেমচন্দ্রের স্থান | *মনোজ মণ্ডল* | ৪৭ |
| হেমচন্দ্রের ছন্দ নির্মিতি কৌশল | *সান্ত্বনা চক্রবর্তী* | ৫৭ |
| 'ভাষা বৈচিত্র্য'—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের নিরিখে | *জয়ন্ত বিশ্বাস* | ৬৪ |
| হেমচন্দ্রের ইংরাজ প্রেম বনাম ভারত প্রীতি | *বরুণকুমার চক্রবর্তী* | ৭২ |
| রবীন্দ্রনাথের হেমচন্দ্র সমালোচনার তাৎপর্য | *বিকাশ পাল* | ৮২ |
| হেমচন্দ্রের খণ্ড কবিতা | *মনোজ নস্কর* | ৯৩ |
| হেমচন্দ্রের কবিতাবলী | *বিবেকানন্দ কাঞ্জিলাল* | ৯৯ |
| মেঘনাদবধ কাব্য ও বৃত্রসংহার বিষয় ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব | *সমরেশ ভৌমিক* | ১২১ |
| বৃত্রসংহার কাব্যের বৃত্র চরিত্র | *পবিত্রকুমার মিস্ত্রী* | ১৩৫ |
| বৃত্রসংহার:শচী চরিত্র | *গৌতম নন্দী* | ১৪৫ |
| প্রসঙ্গ:আশা কানন | *কোয়েল চক্রবর্তী* | ১৫২ |
| হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্তবিকাশ:একটি পর্যালোচনা | *শর্মিষ্ঠা দাস* | ১৬২ |
| দশমহাবিদ্যা:তন্ত্র পুরাণের নূতন ভাবনা | *গৌরী সাঁফুই* | ১৭১ |

# বৃত্র-সংহার কাব্যের বৃত্র চরিত্র

পবিত্রকুমার মিস্ত্রী

বাংলা মহাকাব্যের ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ'-এর পাশাপাশি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্র-সংহার' কাব্যের নাম উচ্চারিত হয়। নামকরণেই স্পষ্ট যে বৃত্রাসুর বধই এ কাব্যের মূল উপজীব্য। মহাদেবের বলে বলীয়ান বৃত্রাসুর এ কাব্যের নায়ক। সমগ্র কাব্যে বৃত্রকে আমরা একাধিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি– প্রজারঞ্জক রাজা, স্নেহশীল পিতা, ত্রিভুবন জয়ী মহাবীর, পত্নী অন্তঃপ্রাণ স্বামী। প্রায় সমস্ত কাব্যজুড়ে একাধিক ভূমিকায় দানবরাজ বৃত্রের কার্যকলাপের নিরিখে তাঁকে আমরা বুঝতে চেষ্টা করবো।

বৃত্র চরিত্রটি পৌরাণিক তা আমরা জানি। "বৃত্র চরিত্রটির উল্লেখ যেমন ভারতীয় পুরাণে এবং মহাকাব্যে রয়েছে তেমনি এর উৎস খুঁজতে শুরু করলে ইরাণীয় সংস্কৃতিতেও তার খোঁজ পাওয়া যাবে। ইরাণী ভাষায় অহর অর্থাৎ যাকে ইন্দ্রের সমতুল্য ধরা যেতে পারে তাঁর সঙ্গে বৃত্রের যুদ্ধের কথা বর্ণিত আছে। সেখানে অহুর বা অহুরমেজদার হাতে বৃত্র নিহত হচ্ছেন বলে অহুরমেজদা 'বেরেত্রেঘ্ন' বলে চিহ্নিত হয়েছেন।" বৃত্রসংহার কাব্যের প্রথম সর্গেই সূর্যদেবের মুখে বৃত্রের নাম প্রথম শোনা যায়। বৃত্রের হাতে পরাজিত দেবগণ স্বর্গ উদ্ধারের জন্য যুদ্ধের মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বৃত্রের বীরত্বের মতোই তাঁর বিরাটআকৃতি চেহারার বর্ণনা কবি সুন্দরভাবে দিয়েছেন–

ত্রিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়,
বিলম্বিত ভুজদ্বয়, দোদুল্য গ্রীবায়
.....
নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস;
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ,

কবির এই উপমা চয়ন সম্পর্কে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন–"পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ" ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি– মিলটনের যোগ্য। বৃত্র-সংহার কাব্য মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।"[২] এছাড়াও

ষষ্ঠ সর্গের যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন–

"দেবদৈত্যর সেই যুদ্ধ বর্ণনা বাংলা ভাষায় অতুল্য; মেঘনাদবধে ইহার তুল্য যুদ্ধ বর্ণনা কোথাও আছে আমাদিগের স্মরণ হয় না। এ বর্ণনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের যোগ্য।"[৩] প্রশংসা করতে গিয়ে সাহিত্যসম্রাট একটু অতিশয়োক্তি করে ফেলেছেন বলে মনে হয়। 'বৃত্র-সংহারের' প্রশংসা করতে গিয়ে 'মেঘনাদ বধ'কে কেন এমন টেনে নামালেন তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এ কূট প্রসঙ্গ আপাতত তোলা থাক।

বৃত্রের দেহ সৌষ্ঠবের উপরোক্ত বর্ণনা পাওয়ার পর তাঁর বীর্যবত্তার প্রতিই পাঠকের আগ্রহ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কাব্যের মধ্যে দু'-একটি জায়গায় এবং একেবারে শেষ সর্গ ছাড়া বৃত্রের বীর্যবত্তা বিশেষ চোখে পড়েনা। বরং অনেক বেশি পিতৃসত্তা ও পত্নীনিষ্ঠ প্রেমিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে বৃত্রের প্রথম সংলাপেই তাঁর প্রেমিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্গরাজ্য দেবতাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন বৃত্র। স্বর্গের সমস্ত সুখ, বিলাস-বৈভব ভোগ করেও বৃত্রপত্নী ঐন্দ্রিলা খুশি নয়। তাঁর ইচ্ছা দেবরাজ ইন্দ্র পত্নী শচী তাঁর কাছে থেকে তাঁর সেবা করবে, যেহেতু তিনি বর্তমানে স্বর্গের অধীশ্বরী। এই অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় ঐন্দ্রিলা স্বামীর প্রতি কপট অভিমান প্রকাশ করলে বৃত্র স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন–

শুনি দৈত্যপতি কহিলা "সুন্দরি,
পাবে শচীসহ শচী সহচরী,
অচিরে তোমার পূরিবে আশ।।"

বৃত্রের মতো বিরাট মাপের বীরের থেকে আর একটু বুদ্ধিমত্তা, সুবিবেচনা কাম্য। শুধুমাত্র স্ত্রীর মন রাখতে নিরপরাধ পরস্ত্রীকে হরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি তাঁর বীরত্বকে কালিমা লিপ্ত করেছেন। এবং এই একটি ভয়ঙ্কর ভুল সিদ্ধান্ত তাঁর পতনকে অনিবার্য করে তুলেছে। "স্ত্রী ঐন্দ্রিলার মান ভাঙাতে ও রাখতে একান্ত স্ত্রৈণের মতো তিনি শচী হরণে উদ্যোগী হয়েছেন। শিবের ক্রোধ টের পেয়েও শুধু স্ত্রীর কথাতে গ্রাহ্য করেননি। একজন মহাকাব্যিক বীর চরিত্রে এই সামান্যতা মানা যায় না।"[৪] বক্তব্যটি পুরোপুরি সমর্থন যোগ্য নয়। তথ্যগত ত্রুটি চোখে পড়ে। 'নিকষ্কর' নামক দানব শচীকে হরণ করে এনেছে কাব্যের নবম সর্গে। বৃত্রাসুর মহাদেবের ক্রোধ টের পাচ্ছেন আরো কিছু পরে, একাদশ সর্গের একেবারে শেষে–





নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-চিহ্ন" জ্বলিয়া উঠিল।

উপরোক্ত পংক্তিদ্বয় দিয়েই কাব্যের প্রথম খন্ড শেষ হয়েছে। কাব্যের দ্বিতীয় খন্ড অর্থাৎ দ্বাদশ সর্গ শুরু হচ্ছে প্রথম খন্ডের শেষ ঘটনার রেশ ধরেই। ত্রিনেত্রে পলক পড়ায় বৃত্র আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তিনি জানেন শিব রুষ্ট হওয়ার পরিণাম। শিব রুষ্ট না হলে তাঁর ভয়ের কোনও কারণ থাকতো না। স্বর্গে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন অতিবাহিত করতে পারতেন। শিবের ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ তিনি অনুমান করতে পেরেছেন। শচী হরণের কারণে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বৃত্র বুঝতে পেরেছেন তাঁর উপর বিরাট একটা ঝড় আসতে চলেছে। হয়তো তাঁর নিধন আসন্ন। পত্নীর আবদার রাখতে গিয়ে তাঁর এই পরিণতি, তাই তিনি এই প্রথম বার প্রিয়তমা পত্নীকে দোষারোপ করছেন–

সকলি হইল ব্যর্থ তোমা হ'তে বামা–
দানবি, দৈত্যের কুল উন্মূল তোমা হ'তে।
ক্রোধান্বিত বিশ্বনাথ, শচী অপমানে
জানাইলা রুদ্র-রোষ বিষাণে নিনাদি,

এমনকি শিবকে তুষ্ট রাখার জন্য শচীকে ছেড়ে দেওয়ার কথাও বৃত্র ভেবেছেন। তিনি স্ত্রীকে সোজাসুজি জানাচ্ছেন–

শচীরে ছাড়িব আমি তুষিতে মহেশে।

কিন্তু ততক্ষণে বৃত্রের যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে। বলা ভালো বড়ো দেরি হয়ে গেছে। দ্বাদশ সর্গে এসে বৃত্র নিজেকে রক্ষা করার জন্য যখন এ উচ্চারণ করছেন তার অনেক আগে অর্থাৎ শচী হরণের পরে পরেই দশম সর্গে আমরা দেখছি মহাদেব দেবরাজ ইন্দ্রকে বৃত্রনাশের উপায় বলে দিচ্ছেন। দধীচি মুনির উরুর হাড় দিয়ে বিশ্বকর্মা 'বজ্র' নামক অস্ত্র নির্মাণ করবেন। এর দ্বারাই বৃত্র নিহত হবে। গোটা দশম সর্গে বৃত্রের কোনো সংলাপ নেই কিন্তু তাঁকে নিয়েই যাবতীয় কার্যক্রম সংগঠিত হয়েছে। সশরীরে না থেকেও দশম সর্গ জুড়ে বৃত্র প্রবলভাবে আছেন।

বৃত্রের পতনের পিছনে তাঁর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস অনুঘটকের কাজ করেছে। তাঁর ধারণা ছিল দেবতারা ভয়ে আর স্বর্গোদ্ধারে আসবেনা। যুদ্ধের সাহস হবে না দেবতাদের। দানবদের ভয়ে দেবতারা পাকাপাকি ভাবে পাতালে ঠাঁই নেবেন বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল–

দৈত্যের প্রহার অঙ্গে যে করে ধারণ,

ফিরিবে না যুদ্ধে আর কখন সে জন।
বৃত্রাসুর থাকিতে, সে সৈন্য দেবতার
স্বর্গের দিকেও কভু চাহিবেনা আর।

পরাজিত জনের প্রতিশোধ স্পৃহা যে প্রবল থাকে এই সহজ সত্য বৃত্র ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই আত্মদর্পী অহংকারের ফাঁক গলে দেবতারা প্রতিশোধের জন্য তৈরি হয়েছে। বৃত্রের আত্মবিশ্বাস আরও অনেকগুণ বেড়ে গেছে যখন তিনি শুনেছেন দেবতারা তাঁদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা দেবরাজ ইন্দ্রকে ছাড়াই যুদ্ধ করতে আসছেন। ইন্দ্রবিহীন দেবসৈন্যদলকে তিনি সমূলে বিনাশ করবেন বলে প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছেন। এমনকি তিনি পরাজিত দেবতাদের এক একজনকে এক একটি কাজে নিযুক্ত করবেন বলে মনস্থির করে ফেলেছেন।

ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তর হাতে 'ভীষণ' নামক দূতের মৃত্যুর খবর পেয়ে বৃত্রাসুর যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। যে দেবতাদের একবার পরাজিত করে স্বর্গের দখল নিয়েছেন, সেই দেবতারাই আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন এতে তিনি ক্রুদ্ধ। তিনি স্বয়ং যুদ্ধে গিয়ে জয়ন্তকে উচিৎ শিক্ষা দেবেন। তার আগে তাঁর সমস্ত দানবসেনাদের বীরবত্তায় উদ্বুদ্ধ করছেন বৃত্র। কিন্তু বৃত্রের যুদ্ধ যাত্রায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর পুত্র বীর রুদ্রপীড়। রুদ্রপীড় জয়ন্তকে যুদ্ধে পরাজিত করার বাসনা প্রকাশ করে বাবার কাছে দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করে। বৃত্র বাধ্য শ্রোতার মতো সব শুনে শান্তভাবে পুত্রের কথার উত্তর দিয়েছেন। পুত্র রুদ্রপীড় অভিযোগ করেছে সব যুদ্ধে যদি স্বয়ং বৃত্র যান এবং জয়ী হন তাহলে পুত্র হিসাবে বীরত্ব দেখানোর সুযোগ সে পাবে কী করে? ভবিষ্যতে কীভাবেই বা তাকে মানুষ মনে রাখবে? রুদ্রপীড়ের অভিমান ও আক্ষেপ– কীর্তিমান জনকের পুত্র হওয়া বৃথা!

স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্বলোকে
.....
বিভব, ঐশ্বর্য, পদ সকলি সে বৃথা!
পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়ের;

বৃত্র পুত্রের এই অকাট্য যুক্তি মেনে নিয়ে পুত্রকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। পুত্রকে আশীর্বাদ করেছেন– যেন পুত্র জয়ী হয়ে আবার তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে পারে। এই ঘটনায় বৃত্রের মধ্যে একই সঙ্গে পিতার মমত্ব ও সুবিবেচক রাজার সন্ধান পাওয়া যায়। রাজা তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারীকে যথাসময়ে এমন সুযোগ দিয়ে তার শক্তি, সামর্থ্য যাচাই করে নেন। বৃত্রও তাই করেছেন।

জয়ন্তকে শিবের ত্রিশূল ছাড়া নিহত করা যাবে না। তাহলে কী শিবের



ত্রিশূল সহ স্বয়ং বৃত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন? মন্ত্রীর এই জিজ্ঞাসাধর্মী উপদেশের প্রত্যুত্তরে বৃত্র বলেন যেহেতু পুত্র সেনাপতিপদে সদ্য আসীন হয়েছে, পুত্রের বীরত্ব পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া উচিৎ, তাই তিনি যাবেন না। ত্রিশূল পুত্রকে দেবেন। এদিকে ত্রিশূল বিনা পুরী রক্ষা হবে না। দেবতারা যে কোনও সময় আক্রমণ করতে পারেন। ত্রিশূল না দেওয়ার পরামর্শ যখন মন্ত্রী দিচ্ছেন, তখন বৃত্রকে আমরা নিজের ভাগ্যের প্রতি আস্থাশীল থাকতে দেখি–

সুমিত্র হে,
এই ভাগ্য যতদিন থাকিবে বৃত্রের,
জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে– কিংবা অকুশল;

ভাগ্য বা নিয়তির প্রতি প্রবল আস্থাশীলতার অন্তরালে বৃত্রের সুচিন্তিত পিতৃত্ব লুকিয়ে আছে। পুত্র রুদ্রপীড় প্রথমবার বড়ো কোন যুদ্ধে যাচ্ছে, পিতা হিসাবে বৃত্র কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চান না। তিনি জানেন শিব প্রদত্ত মহা ত্রিশূলের ক্ষমতা। মহা ত্রিশূল কাছে থাকলে রুদ্রপীড়ের জয় যে নিশ্চিত বা তার অনিষ্টের আশঙ্কা নেই তা তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারেন। তাই নিজের সুরক্ষার তুলনায় পিতা হিসাবে যুদ্ধযাত্রী পুত্রের সুরক্ষার কথা সঙ্গত কারণেই তিনি আগে ভেবেছেন। তাছাড়া তখন শচী হরণের বিষয়টি ঘটেনি, তাই বৃত্র স্বাভাবিকভাবেই জানেন তাঁর উপর 'চন্দ্রশেখরের দয়া' অটুট।

শচী হরণের পর 'চন্দ্রশেখরের দয়া' বৃত্রের উপর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। ভাবী পতনের পূর্বাভাস যখন বৃত্র পেয়ে গেছেন, তখন এই বৃত্রকে আমরা অন্যরূপে দেখতে পাই। পুত্র রুদ্রপীড় দেবরাজ ইন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পিতার কাছে অনুমতি নিতে এসেছে। পুত্রকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় বৃত্রের দু'চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তিনি ভবিতব্য অনুমান করতে পেরেছেন। দেবরাজ ইন্দ্রকে একমাত্র বৃত্রই পরাস্ত করতে পারেন। পুত্র ইন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবে শুনে বৃত্রের বীরধর্ম ও পিতৃত্বের মধ্যে ক্ষণিক বিরোধ দেখা দিয়েছে।

কিন্তু বীর তুই - বীরপুত্র-মহারথী,
কেমনে নিবারি তোরে? কেমনে বা বলি,
যাও বৎস, দৈত্যকুল-রবি অস্তে যাও?

একেই বোধহয় বলে 'মহাকাব্যিক দ্বন্দ্ব'। সমগ্র মহাকাব্যে বৃত্রের এমন মানসিক দ্বন্দ্ব আর দেখা যায় না। মহাবলী বৃত্র এই মানসিক দ্বন্দ্ব অচিরেই কাটিয়ে উঠেছেন। তাঁর কাছে পিতৃত্বের থেকে বীরত্ব অনেক সম্মানের বলে মনে হয়েছে।

পিতার সমস্ত আবেগ সংযত করে বলেছেন। –

না নিবারি তোমা,
যাও রণে, অরিন্দম পুত্র রণজয়ী;
পালো বীর ধর্ম্ম, ভাগ্যে যা থাকে আমার।

বৃত্রের বীরধর্ম আরও বোঝা যায় যখন তিনি সম্ভাব্য পরাজয় নিশ্চিত জানার পরও বীরত্বের নিশান উঁচিয়ে রাখেন। মন্ত্রীদের মনোবল অটুট রাখার জন্য প্রকৃত বীরের মতো বলেন– বীরকুলে যেহেতু রাক্ষসদের জন্ম, তাই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর হাতে মরণই শ্রেষ্ঠ মরণ। মৃত্যুভয়ে যুদ্ধে বিরত থাকা প্রকৃত বীরের উচিৎ কাজ নয়। রাক্ষসকুলের একমাত্র অস্ত্রধারী হিসাবেও তিনি যদি বেঁচে থাকেন, শরীরে রক্তের প্রবাহ যদি সচল থাকে তাহলে একমাত্র অস্ত্রধারী হলেও আজীবন 'দূরন্ত রণে' রত থাকবেন–

.....
পারিব ধরিতে অস্ত্র এ প্রচন্ড ভুজে,
বহিবে রুধির-স্রোত এ দেহে আমার।
নাহি ক্ষান্ত তত দিন এ দুরন্ত রণে।

বৃত্র একাধারে মহাবলী মহাবীর, স্নেহপরায়ণ পিতা, যত্নশীল স্বামী এবং একই সঙ্গে তিনি প্রজাহিতকর একজন শাসক। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রচুর দানবসেনা নিহত হলে তাঁর প্রাণ কাঁদে। তিনি মনে করেন– রাজা একা জয়ী হয়ে কী করবেন? জয় উদযাপনের জন্য তো প্রজাদের দরকার, তাদের আনন্দ দেখেই তো রাজার আনন্দ। রাজার অস্তিত্বই তো প্রজাদের উপর নির্ভরশীল। সেই প্রজারাই যদি দিন দিন কমে যায়, যুদ্ধে নিহত হয়, তাহলে যুদ্ধ জিতে লাভ কী? জয়ের আনন্দ যদি সবাই মিলে উপভোগ না করা যায়, তাহলে আনন্দের মাত্রা কিছু কমে বইকি! প্রজারঞ্জক বৃত্রের এমন ভাবনা তাঁকে অত্যন্ত মানবিক সুকোমল মনোবৃত্তিসম্পন্ন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। কতজন রাজা এমনভাবে ভাবতে পারেন? রাজারা সাধারণত নিজেদের বাহুবল দেখাতেই মগ্ন থাকেন। যেন তেন প্রকারেণ যুদ্ধ জয়ই রাজাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ তাতেই তাঁদের যাবতীয় খ্যাতি, ঐশ্বর্য, প্রতাপ প্রভৃতি। বৃত্র তাঁর চিন্তা চেতনায় অন্য রাজাদের তুলনায় এখানে আলাদা–

প্রতি রণে যদি দৈত্য কুল ক্ষয়
হয় হেন রূপে, কারে লয়ে জয়
ভুঞ্জিব তবে?



এমন মহান প্রজাদরদী সুবিবেচক চিন্তানায়ক বৃত্রাসুর আমাদের মনে চিরস্থায়ী আসন পেয়ে যান তাঁর ব্যতিক্রমী মানসিকতার জন্য।

ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে বৃত্রের প্রাণপ্রিয় পুত্র রুদ্রপীড় নিহত হয়েছে। রুদ্রপীড়ের মৃত্যু সংবাদ সারথি বহ্নিক ইন্দ্রের পুষ্পক রথে করে বয়ে এনেছে। রুদ্রপীড়ের শেষ ইচ্ছানুযায়ী তার রণসজ্জাও এনেছে বহ্নিক। পুত্রের মৃত্যুতে উন্মাদিনীপ্রায় ঐন্দ্রিলা স্বামীকে মৃদু ভর্ৎসনা করছেন। বৃত্রও শোকে মুহ্যমান। কিন্তু সাময়িক শোক কাটিয়ে উঠে তিনি বীরের মতো রণহুঙ্কার ছেড়েছেন–

সাজরে দানববৃন্দ – সংহারের রণে।

পুত্রশোকের চিতার আগুন তাঁর হৃদয়ে আমৃত্যু প্রজ্জ্বলিত থাকবে। বিধাতা নির্মম হয়ে তাঁদের একমাত্র আশাবৃক্ষকে নির্মূল করেছেন। নিষ্ঠুর বিধাতার প্রতি অভিযোগ জানিয়ে তিনি পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। ঐন্দ্রিলার বিলাপ দেখে বৃত্রাসুর শোকাতুরা স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছেন–

কি হবে বিলাপে এবে? হা রে অভাগিনি,
বিলাপের বহুদিন পাইবে পশ্চাৎ,
আক্ষেপের এ নহে সময়; আগে ঘাতি
পুত্রঘাতী ইন্দ্রের হৃদয় এ ত্রিশূলে,

'মেঘনাধ বধ' কাব্যের ছায়া স্পষ্ট। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের 'শক্তি নির্ভেদো' নামক সপ্তম সর্গে প্রাণপ্রিয় পুত্র ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান রাণী মন্দোদরীকে রাক্ষসরাজ রাবণ সান্ত্বনা দিচ্ছেন এই বলে–

"রণক্ষেত্র যাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!"[৫]

সমগ্র বৃত্রসংহার কাব্যের মধ্যে এমনভাবে 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের অনুকরণ বা অনুসরণ মাঝে মাঝেই লক্ষ করা যায়। বিশেষত চরিত্র পরিকল্পনায় এই সাযুজ্য একটু বেশিই পরিলক্ষিত হয়। "বৃত্রসংহার-এর চরিত্রগুলি যেন পরিচ্ছেদ পালটিয়ে বা না পালটিয়ে মেঘনাদ বধ-এর চরিত্র হয়ে উঠেছে। রাবণ ও বৃত্র, ইন্দ্র ও রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও জয়ন্ত, মেঘনাদ ও রুদ্রপীড়, সীতা ও শচী যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।"[৬] অন্য চরিত্রগুলির কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু বৃত্র ও রাবণের তুলনা যদি হয়, তাহলে দেখা যায় বৃত্রের তুলনায় রাবণের বীর্যবত্তা, দ্বন্দ্ব, চারিত্রিক গভীরতা অনেক বেশি। রাবণ নিজের কর্মফল ভোগ করেছেন। বৃত্র স্ত্রীর মনোরঞ্জন করতে গিয়ে শচীকে বন্দী করে এনে নিজে এবং সমগ্র দানবকুলকে ডুবিয়েছেন। তাঁর এই পতনের পিছনে অনুঘটকের কাজ করেছে তাঁর স্ত্রী ঐন্দ্রিলা।

কিন্তু বৃত্রের মতো একজন তপস্বী, মহানুভব, ত্রিভুবনজয়ী বীর শুধুমাত্র স্ত্রীকে খুশি করার জন্য বিচারবোধ বিসর্জন দিয়ে হঠকরীর মতো শচী হরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। এতে তাঁর বীরত্ব, মহত্ত্ব কালিমালিপ্ত হয়েছে। একজন রূপবতী, গুণবতী নারীর প্রতি আরেকজন নারীর সহজাত ঈর্ষাবোধকে তিনি ধরতে পারেননি। স্ত্রীর প্রতি একটু বেশিই দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছেন। স্ত্রী ছাড়াও অন্য নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেও বৃত্রকে দেখা যায়। তাছাড়া সেই নারী যদি সাধারণ না হয়ে শচীর মতো কেউ হন তাহলে সম্মান জানাতে হয় বইকি। যতই তিনি স্ত্রীর কথায় শচীকে হরণ করে আনার নির্দেশ দিন না কেনো। স্বর্গের অধীশ্বরীর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধাবোধ থাকা খুব স্বাভাবিক। তাই নিকন্ধর দানব শচীকে আনামাত্রই বৃত্রাসুর শচীকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছেন–

শচীমূর্তি দৈত্যপতি,
নেহারি অনন্যগতি,
চমকি সম্ভ্রমে শীঘ্র উঠি দাঁড়াইল।

প্রায় সমগ্র কাব্যে দু'-একটি ক্ষেত্রে ছাড়া বৃত্রকে আমরা চিন্তাশীল, ব্যক্তিত্বময় দানবরাজ হিসাবে দেখতে পাই। সেখানে বৃত্রপত্নী ঐন্দ্রিলা অনেক বেশি আবেগপূর্ণ, গড্ডালিকাপ্রবাহে ভাসমান অহংকারী দানবী রূপে অঙ্কিত। কাব্যের শেষ পর্যায়ে দ্বাবিংশ সর্গে বৃত্র যেন কিছুটা আলগা, সুগভীর চিন্তাশক্তি রহিত। ঐন্দ্রিলার মন ভারাক্রান্ত দেখে তিনি স্ত্রীকে আনন্দ ফূর্তিতে সময় অতিবাহিত করতে বলছেন। কারণ তাঁদের পুত্র রুদ্রপীড়ের বীরত্বে দেবতারা পলায়ন করেছেন। পিতা-মাতা হিসাবে যা তাঁদের অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের। তাই তিনি মনে করেন এখন আনন্দে মেতে ওঠা উচিৎ। বৃত্রের এহেন অবিবেচকের মতো মনোভাব বিস্ময়কর! তিনি জানেন ইন্দ্রের সঙ্গে রুদ্রপীড়ের যুদ্ধ এখনো হয়নি। তার পরিণতিও তাঁর অজানা নয়। তাছাড়া মহাদেবের রুষ্ট হওয়ার কথা সাময়িকভাবে তিনি কী বিস্মৃত হয়েছেন? নাকি নিছক স্ত্রীকে সর্বদা খুশিতে রাখাকে তিনি কর্তব্যজ্ঞান করেন? এরকমই টুকরো টুকরো ঘটনার কারণে বৃত্রের বীরধর্মকে ছাপিয়ে গেছে তাঁর গার্হস্থ্যধর্ম বা স্নেহবৎসল পিতৃধর্ম। রুদ্রপীড়ের যুদ্ধজয় সত্ত্বেও ঐন্দ্রিলা তাঁর মনমরা অবস্থার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। পুত্রবধূ ইন্দুবালা শচীর পদতলে আশ্রয় নিয়েছে। দানবকুলের কাছে ও অত্যন্ত লজ্জার। পুত্র রুদ্রপীড় যুদ্ধযাত্রার আগে মায়ের কাছে ইন্দুবালাকে সমর্পণ করে বলেছিল সাবধানে রাখতে। ঐন্দ্রিলা সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। এটাই তাঁর মনোবেদনার কারণ। ইন্দুবালার শচীর চরণে স্থান নেওয়া অনেকটা যেন



বিভীষণের রামের পক্ষ অবলম্বন করা। এও এক ধরণের নৈতিক পরাজয়।

কাব্যের শেষ সর্গে এসে বৃত্রাসুরের বীরত্বকে কবি মহিমান্বিত রূপে দেখাতে চেয়েছেন। তবে সেখানেও শেষ পর্যন্ত তাঁর বীরত্বকে ছাপিয়ে পিতৃ হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। শিবের আশীর্বাদপুষ্ট মহা ত্রিশূল দেবতাদের উদ্দেশে নিক্ষেপ করার পর যখন আকাশে তা হারিয়ে যাচ্ছে তখন বৃত্রের হতাশা চরমে পৌঁছেছে। তিনি খেদোক্তি করেছেন–

কহিলা কৈলাসে চাহি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি,
'হা শম্ভু, তুমিও বাম।'

কিন্তু এই হতাশা বৃত্রকে গ্রাস করতে পারেনি, বরং আরো বেশি জেদী, ধ্বংসাত্মক করে তুলেছে। প্রদীপ নেভার আগে যেমন দপ করে জ্বলে ওঠে বৃত্রও তেমনি অন্তিম সময়ে এসে ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছেন। কবি বৃত্রের রুদ্ররূপের ভয়ঙ্কর বর্ণনা দিয়েছেন–

লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভূজ তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা ক্রোধে নক্ষত্রমন্ডলী,
.....
ব্রহ্মান্ড উচ্ছিন্নপ্রায়, কাঁপিল জগৎ,

বৃত্রের প্রবল পরাক্রমে ইন্দ্র প্রায় জ্ঞান হারিয়েছেন। মনে রাখতে হবে এ সময়ে বৃত্রের উপর 'চন্দ্রশেখরের দয়া' নেই। তবে শেষ পর্যন্ত প্রিয়তম পুত্রের কথা স্মরণ করতে করতেই মহাবলী বৃত্রাসুর অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন।–"হা বৎস, হা রুদ্রপীড়"– এটাই মৃত্যুর পূর্বে বলা তাঁর শেষ বাক্য। প্রবল পরাক্রমী বীর্যবত্তাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে একজন স্নেহকোমল পিতার হাহাকার। সন্তানের প্রতি পরম স্নেহময় পিতৃসত্তার প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হচ্ছে।

'মেঘনাদ বধে' মেঘনাদের তুলনায় রাবণের doing ও Suffering ও যেমন বেশি, তেমনি 'বৃত্র-সংহারে' বৃত্রের তুলনায় তাঁর পুত্র রুদ্রপীড়কে অনেক বেশি উজ্জ্বল মনে হয়েছে। তার চরিত্রে স্খলন কম। ঘটনার কেন্দ্র–বিন্দুতে বৃত্র, কিন্তু খানিকটা যেন নিষ্প্রভ।

**উল্লেখপঞ্জি :**

১. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় দে, কবি হেমচন্দ্র ও বৃত্রসংহার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৮১।

২. তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা), কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত বৃত্র-সংহারে, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম অখন্ড দে'জ সংস্করণ : শ্রাবণ ১৪১২, আগস্ট ২০০৫, পৃষ্ঠা: ১৮৬।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা : ১৯২।

৪. তদেব (ভূমিকাংশ), পৃষ্ঠা: ১৬।

৫. সব্যসাচী রায় (সম্পাদনা), মধুসূদন রচনাবলী, কামিনী প্রকাশালয়, দ্বিতীয় প্রকাশ: মাঘ, ১৪০৩, পৃষ্ঠা: ১০৯।

৬. ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পাদনা), প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, রত্নাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ/দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১লা বৈশাখ ১৪১৬/১৫ এপ্রিল ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৩৯৭।